বেঙ্গল টাইমস

১০ জুন, ২০২৩

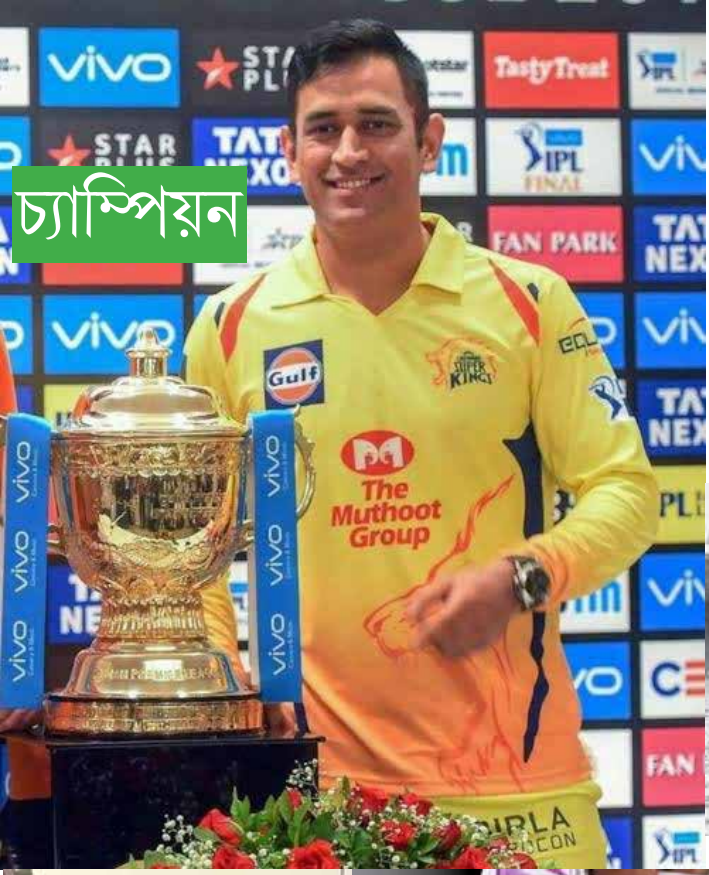

চ্যাম্পিয়ন

রাজদম্ভ

বিদায় ২০০০

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ কাহিনি

ছবি তুলে ধোনিকে ভেসে থাকতে হয় না

❑ সোহম সেন

রাজনীতি

পিসিকে ডোবাতে তিনিই যথেষ্ট

❑ রক্তিম মিত্র

বায়রনকে বরং অভিনন্দন জানান

❑ অজয় কুমার

বিশ্বাসের সিংহাসন থেকে তাঁকে কে সরাবে!

❑ স্বরূপ গোস্বামী

মিডিয়া সমাচার

ঈশ্বর গুপ্ত

খেলা

পানশালা উদ্বোধনই মেগা ইভেন্ট

❑ অজয় নন্দী

ফিচার

২ হাজারি আত্মকথা

❑ স্বরূপ গোস্বামী

স্মার্টফোন থাকা মানেই স্মার্ট

❑ প্রসূন মিত্র

বিনোদন

রাজনীতিটাই নেই

❑ স্নেহা সেন

চুমকি যেন আশা পারেখ

❑ প্রজ্ঞাদীপা হালদার

ভ্রমণ

শান্ত গ্রাম বারমেক

❑ রুমা ব্যানার্জি

স্নিগ্ধতায় মোড়া কোলাখাম

❑ সুব্রত মণ্ডল

কুয়াশাঘেরা পাবং

❑ নূপুর রায়

নিয়মিত বিভাগ

আহারে বাহারে

স্মৃতিটুকু থাক

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন। সম্পাদকীয় কার্যালয়: কে বি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা ১০৬। ফোন: ৯৮৩১২২৭২০১, আইএসএসএন— ২৪৪৫ ৫৬৫৭

ই-মেল: bengaltimes.in@gmail.com, ওয়েবসাইট: bengalttimes.in

সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী

সম্পাদকীয়

পোয়েটিক জাস্টিস

প্রায় দু'মাস ধরে চলল আইপিএলের মহাযজ্ঞ। কিন্তু গোটা আইপিএল জুড়ে যেন হলুদ ঝড়। সবাই যেন চেন্নাইয়ের সমর্থক। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, সবাই যেন ধোনির সমর্থক। যে মাঠেই তিনি খেলতে গেছেন, সেই মাঠের গ্যালারিই যেন হলুদ রঙে রেঙে উঠেছে। তা ইডেন হোক বা কোটলা। ওয়াংখেড়ে হোক বা মোতেরা। একজন বিয়াল্লিশ বছরের ক্রিকেটারকে ঘিরে এমন উন্মাদনা! সবমিলিয়ে অন্য এক বার্তা রেখে গেল এবারের আইপিএল। কী অদ্ভুত পোয়েটিক জাস্টিস। রোমাঞ্চকর ফাইনাল শেষে কাপও কিনা ধরা দিল তাঁর হাতেই।

ওদিকে, বাংলা জুড়ে চলছে 'নবজোয়ার'। কোনও একজন সারা বাংলায় আড়াই হাজার পুলিশ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর কর্মসূচিকে সফল করতে জেলায় জেলায় ডিএম, এসপি-দের নাভিশ্বাস উঠছে। প্রায় সব জায়গায় গাড়ির ছাদে উঠে পড়ছেন। ভাষণের নামে 'আমি আমি আর আমি'। ক্ষমতার দম্ভ প্রকট হয়ে পড়ছে। বুঝিয়ে দিচ্ছেন তিনি এক বিরাট মাতব্বর। বাকি সবাই তাঁর চাকর-বাকর। ধন্যি শাসকদলের নেতারা। তাঁরা যে চাকর-বাকর গোত্রের, এটা প্রমাণ করতে তাঁরাও যেন মরিয়া। এদিকে, পঞ্চায়েত ভোটের দামামাও বেজে গেছে। পাঁচ বছর আগে ভোটের নামে যা হয়েছিল, তা নির্লজ্জ প্রহসন। এবারও কি তেমনটাই হবে? প্রশাসন কি আবার ঠুঁটো জগন্নাথ হয়েই থাকবে। সময় বলবে।

এবারের সংখ্যায় রাজনীতি যেমন আছে, খেলাও আছে। আর বিনোদন, ভ্রমণ তো আছেই। সবমিলিয়ে এবার পাঁচমিশেলি সংখ্যা। তবে পরের সপ্তাহে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন। তাঁকে নিয়ে একটা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে। তার প্রস্তুতি চলছে। সেই সংখ্যায় রাজনীতি, খেলা, ভ্রমণ মুলতুবি। সেবার শুধুই হেমন্ত। চাইলে পাঠকরাও লেখা পাঠাতে পারেন। সাদর আমন্ত্রণ রইল।

ছবি তুলে ধোনিকে ভেসে থাকতে হয় না

সোহম সেন

একেক শহরের নামে দল। অর্থাৎ, সেই দলের হয়ে চিৎকার করবেন সেই শহরের মানুষ। কিন্তু কোথায় বা কী? সব বেড়াজাল যেন একাই ভেঙে দিয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।

কলকাতা হোক বা দিল্লি, যেখানেই তিনি মাঠে নামলেন, গ্যালারির রঙ হয়ে উঠল হলুদ। ভাবা যায়, কলকাতার দর্শকেরা নাইট রাইডার্সের হয়ে গলা না ফাটিয়ে হলুদ জার্সি পরে এসে ‘ধোনি–ধোনি’ চিৎকার করে যাচ্ছেন! সম্ভবত এটাই ধোনির শেষ আইপিএল। তাঁকে ঘিরে একটা আবেগের স্রোত কাজ করবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে খোদ ইডেনের মাঠে নাইটের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে! ঘরের ছেলে না রাখলে কী হয়, এবার নাইট কর্তারা বুঝলেন তো! শুধু কি তাই! আমেদাবাদের মাঠে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে ফাইনাল। সেখানেও কিনা গ্যালারি কার্যত দু’ভাগ। ফাইনালেও নিজের দলকে সমর্থন না করে চেন্নাইয়ের হয়ে গলা ফাটানো যায়! চেন্নাই ট্রফি জেতার পরে এভাবে ‘ধোনি’ ‘ধোনি’ বলে চিৎকার করা যায়! কে বলে আইপিএল শুধুই বাণিজ্য নির্ভর? কে বলে আইপিএলে আবেগের জায়গা নেই! ৪২ বছরের একটা মানুষ যেন বুঝিয়ে দিলেন, তিনি একাই সব মিথ ভেঙে ফেলতে পারেন।

কিন্তু ধোনির নামে এই উন্মাদনা কেন? কারণ, আর দশজনের থেকে তিনি অনেকটাই আলাদা। তাঁকে অহরহ নিজের ঢাক নিজেকে পেটাতে হয় না। তাঁকে প্রতিনিয়ত টুইটার বা ইনস্টাগ্রামে ভেসে থাকতে হয় না। সবসবময় হ্যাংলার মতো ছবি পোস্ট করে নিজেকে প্রাসঙ্গিক রাখতে হয় না। একটা ম্যাচে রান পেলেই প্রাক্তনদের উদ্দেশে কুৎসিত আক্রমণ করতে হয় না। তিনি জানেন, কীভাবে নিজেকে প্রচারের আলোর আড়ালে রাখতে হয়। তিনি নিঃশব্দে টেস্ট থেকে অবসর নিতে পারেন। তিনি নিঃশব্দে সাদা বলের ক্রিকেটের নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে পারেন। তাঁর কোনও ফেয়ারওয়েল ম্যাচ লাগে না। তাঁকে লম্বা চওড়া ভাষণও দিতে হয় না। তিনি মাসের পর মাস সেনা বাহিনির ব্যারাকে প্রশিক্ষণ নেন। কেউ জানতেও পারে না। অহরহ ছবি ছেড়ে সেটাকে ইভেন্ট বানাতে চান না।

গোটা গ্যালারি তাঁকে দেখার জন্য উন্মুখ। তাঁর জন্যই গ্যালারি রেঙে উঠেছে হলুদ রঙে। অথচ, তিনি কিনা ব্যাট করতে নামছেন সেই আট নম্বরে। কোনও ম্যাচে সুযোগ পেলেন এক ওভার। কোনও ম্যাচে এক বা দুই বল। অথচ, চাইলেই তিনি তিনে বা চারে আসতে পারতেন। ব্যাট হাতে ঝড় তুলতে পারতেন। সর্বোচ্চ রানের তালিকায় প্রথম তিন–চারের মধ্যেই থাকত তাঁর নাম। যদি একদিনের ক্রিকেটে সাত নম্বরে না নামতেন, নামের পাশে হয়ত তিরিশ খানা সেঞ্চুরি থাকত। কিন্তু হেলায় সেসব ছাড়তে পারেন। টেস্ট ছেড়েছেন সেই ২০১৪তে। আর যদি এক বছর খেলতেন, একশো টেস্টের মাইলস্টোনে পৌঁছে যেতেন। হাসতে হাসতে সেইসব প্রলোভনকে উপেক্ষা করতে পারেন।

এইসব ত্যাগের কথা রেকর্ড বইয়ে থাকে না। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি দৌড়ে কোথাও একটা সেই মানুষটাকে এগিয়ে দেয়। তাই যাঁদের নামের পাশে একশো টেস্ট বা দশ হাজার রান আছে, দিনের শেষে সেই মানুষগুলোকেও কোথাও একটা ছোট মনে হয় এই মহামানবের কাছে।

ওপেন ফোরাম

পিসিকে ডোবাতে ভুঁইফোড় ভাইপোই যথেষ্ট

রক্তিম মিত্র

সিবিআইয়ের চেষ্টার কোনও ত্রুটি নেই। তাঁরা বল নিয়ে ছোটাছুটি করে পেনাল্টি বক্স পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপর বল বাইরে মারে।

কারণ, কর্তাদের সেটাই নির্দেশ। আসল লোককে ছোয়া চলবে না। লোক দেখানো দু-এক বার ডাক পাঠাও। ব্যাস, এই পর্যন্ত। এর বেশি যেন বেকায়দায় না ফেলা হয়।

কিন্তু সিবিআই বোধ হয় চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারবে না। কারণ, ভাইপো সেমসাইড গোল করেই চলেছেন। সিবিআই যতই বাঁচানোর চেষ্টা করুক, ভাইপো নিজেই স্বখাতসলিলে ডুবতে মরিয়া। শুধু নিজে ডুববেন না। পিসিকেও সঙ্গে নিয়ে ডুববেন।

বেরিয়ে এসেই তিনি লম্বা চওড়া ভাষণ ঝাড়েন।

আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ দেখিয়ে দিক। আমি সিবিআই কে চ্যালেঞ্জ করছি। আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করছি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কয়েকদিন আগে সিবিআই জেরা থেকে বেরিয়ে এসে এমন ডায়লগ ঝেড়েছিলেন। 'নব জোকার' কর্মসূচিতে গাড়ির ছাদে ওঠে রোজ নিয়ম করে এমন ডায়লগ ঝাড়ছেন। রুজিরাকে ইডি ডেকেছে শুনেই রাতের বেলায় আবার সেই মিডিয়ার সামনে আসা। আবার সেই একই ভাষণের পুনরাবৃত্তি।

যত দিন যাচ্ছে, যুক্তি, বুদ্ধি সব যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছে। কাকে আক্রমণ করতে গিয়ে কাকে আক্রমণ করে বসছেন, একবার ভেবেও দেখছেন না। আপাতভাবে মনে হবে, শুভেন্দু অধিকারীর দিকে তোপ দাগছেন। বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাচ্ছেন। চ্যানেলে সেরকমই বলা হচ্ছে। কাগজে সেরকমই বেরোচ্ছে। কিন্তু আসলে, রোজ নিয়ম করে নিজের পিসিকেই অপদার্থ বলে চলেছেন। নিজের পিসির গালেই যেন থাপ্পড় মেরে চলেছেন।

নিয়ম করে তিনি বলে চলেছেন, নারদার ভিডিওতে শুভেন্দু অধিকারীকে হাত পেতে টাকা নিতে দেখা গেছে। তারপরেও বিজেপি তাকে দলে নিয়েছে। বিজেপির কথা ছেড়ে দিন, নারদার সেই ভিডিও সামনে আসে ২০১৬-র এপ্রিলে। তার পরের মাসেই তাঁর পিসি মমতা ব্যানার্জি তাঁকে নিজের মন্ত্রীসভায় নিয়েছিলেন। অর্থাৎ, টাকা নিচ্ছেন দেখার পরেও তাঁকে মন্ত্রী করা হয়। পাঁচবছর তাঁকে তিন খানা দপ্তরের মন্ত্রী রেখে দেওয়া হয়। তাহলে, আঙুলটা কি পিসির দিকেও উঠছে না?

মুখ্যমন্ত্রী তখন তারস্বরে বলেছিলেন, এটা ফেক ভিডিও। তাঁদের বদনাম করার জন্য বানানো হয়েছে। যদিও পরবর্তীকালে দেখা গেছে,

ভিডিওটা মোটেই জাল নয়। তাহলে, সেদিন মুখ্যমন্ত্রী না জেনে এমন ডাঁহা মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন কেন? পিসি যাকে ফেক ভিডিও বলেছিলেন, সেই ভিডিও-র ওপর ভিত্তি করে ভাইপো অন্যজনকে আক্রমণ করছেন। তাহলে কে ঠিক, পিসি না ভাইপো? আসলে, ভাইপোও বুঝিয়ে দিলেন, ভিডিওটা সত্যিই ছিল, পিসিই সেদিন মিথ্যে কথা বলেছিলেন। পিসির গালে এ যেন আরেক থাপ্পড়।

এবার আসুন এসএসসি-র প্রশ্নে। ভাইপো রোজ নিয়ম করে বলে যাচ্ছেন, এসএসসি থেকে সবথেকে বেশি টাকা তুলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। এমনকী, সিবিআইকেও সেই কথাই জানিয়েছেন। আচ্ছা, এইসব অভিযোগগুলো কোন সময়ের? ভাইপো নিজেই জানিয়েছেন, ২০১৪ থেকে ১৯ পর্যন্ত। আচ্ছা, সেই সময় শুভেন্দু কোন দলে ছিলেন? শুভেন্দু তো শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন না। অর্থাৎ, তাঁর তো প্রত্যক্ষভাবে চাকরি করে দেওয়ার ক্ষমতাও ছিল না। অর্থাৎ, শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে অথবা দলের কাছে নাম জমা দিতে হয়েছিল। সেই তালিকা অনুমোদিতও হয়েছিল। এসএসসি-র চাকরি। অথচ, তালিকা দিচ্ছেন পরিবহণ মন্ত্রী। আর সেই তালিকায় থাকা সবার চাকরিও হয়ে যাচ্ছে। আসল দায়টা তাহলে কার? পরিবহণমন্ত্রীর দেওয়া তালিকায় শিক্ষা দপ্তরে হাজার হাজার চাকরি হচ্ছে, এটা যদি মুখ্যমন্ত্রী না জানেন, তাহলে কে জানবে?

আর যদি জেনেও কোনও ব্যবস্থা নেননি, তিনটে জেলা শুভেন্দুকেই টাকা তোলার সুযোগ দিয়েছিলেন, তাহলেও কি মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করা হচ্ছে না? তাঁর মন্ত্রীসভার গুরুত্ব পূর্ণ একজন সদস্য পাঁচ বছর ধরে হাজার হাজার যোগ্য প্রার্থীকে বঞ্চিত করে টাকার বিনিময়ে ভুয়ো প্রার্থীদের ঢুকিয়েছেন, এটা জানার পরেও পাঁচ বছরে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারলেন না?

আসলে, ভুয়ো ডিগ্রির এই ভুঁইফোড় ভাইপো কাকে আক্রমণ করছেন, নিজেও জানেন না। আক্রমণ করছেন শুভেন্দুকে। কিন্তু প্রতি পদে অপদার্থ বলছেন নিজের পিসিকেই। এমন ভাইপো থাকলে আর বিরোধীর দরকার হয় না। পিসিকে ডোবানোর জন্য এই ভুঁইফোড় ভাইপোই যথেষ্ট।

গালাগাল নয়, বায়রনকে বরং অভিনন্দন জানান

অজয় কুমার

বায়রন বলতেই এতকাল আমরা বুঝতাম এক ইংরেজ কবিতে। গড়পড়তা বাঙালি ইংরাজি কবিতা পড়ুক বা না পড়ুক, পাঠ্যপুস্তকের দৌলতে বা নানা আলোচনায় শেলি, কিটস, বায়রন কথাগুলোর সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই পরিচিত। কিন্তু গত দু-তিন মাস বায়রন শব্দটা আমবাঙালির কাছে যেন অন্য এক পরিচিতি নিয়ে হাজির হয়েছিল। গুগলে বায়রন লিখলেই এসে যেত বায়রন বিশ্বাস নামের এক যুবকের নাম। সঙ্গে এসে যেত সাগরদিঘি শব্দটা। রাজনীতির পরিভাষায় যোগ হয়েছিল দুটো নতুন শব্দবন্ধ— 'সাগরদিঘি মডেল'।

এই বায়রনের নাম মাস তিন-চার আগেও

বাঙালি শোনেনি। এই নামে যে কংগ্রেসের কোনও নেতা আছেন, খোদ কংগ্রেসের লোকেরাই জানতেন না। কিন্তু একটা উপনির্বাচন যেন একেবারে সামনের সারিতে এনে দিল বায়রন বিশ্বাস নামটাকে। বিধানসভায় বামেদের কোনও প্রতিনিধি নেই। কংগ্রেসেরও ছিল না। সেখানে অন্তত একজন যদি বিধানসভায় ঢোকার ছাড়পত্র পান, তার একটা বাড়তি তাৎপর্য আছে বৈকি। তাছাড়া, সাগরদিঘির ফল তো নিছক একটা উপনির্বাচনের ফল ছিল না। অনেকগুলো বার্তা রেখে গিয়েছিল এই সাগরদিঘি। ১) ঠিকঠাক লড়াই দিতে পারলে তৃণমূলকে হারানো যায়। ২) সংখ্যালঘু ভোট মানেই তৃণমূলের একচেটিয়া নয়। যেখানে লড়াইয়ের ক্ষেত্র থাকবে, সেখানে তাঁরা তৃণমূলের বিকল্প ঠিক বেছে নেবেন। ৩) এত হাজার লিড মানেই টেকেন ফর গ্র্যান্টেড নয়। মানুষ সুযোগ বুঝলেই সমীকরণ বদলে দিতে পারে। ৪) তৃণমূলের বিকল্প মানেই বিজেপি নয়। মানুষ যেখানে তৃণমূল বিরোধী শক্তি বলে যাকে মনে করবেন, তাঁর ওপরই আস্থা রাখবেন।

কিন্তু যা হয়! জয় করে তবু ভয় যায় না। এই মুহূর্তে তৃণমূলের বিধায়ক সংখ্যা কত, তারা নিজেরাও জানে না। অন্তত ২২০ তো বটেই। এরপরেও বিরোধী দলের একজন জিতে গেলে, যেভাবেই হোক, তাকেও গিলে ফেলতে হবে।

প্রলোভন দাও। তাতে কাজ না হলে কোণঠাসা করো। তাতেও কাজ না হলে হুমকি দাও। মোদ্দা কথা, 'বাবু কহিলেন, বুঝেছ উপেন এ জমি লইব কিনে।' একজন বিরোধী জিতেছে? তাকেও চাই। মোদ্দা কথা, আমার বিরুদ্ধে কথা বলার যেন কেউ না থাকে।

বেচারা বায়রন! কতক্ষণ আর একা লড়াই করে যাবেন! ভোটে জেতা এক জিনিস। কিন্তু বারো মাস প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়া আরেক জিনিস। থানার ওসি পাত্তা দিচ্ছে না। বিডিও ফোন ধরছে না। পাড়ার এলি-তেলি নেতারাও চমকে দিচ্ছে। বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তুমি বিধায়ক হতে পারো, কিন্তু তোমার থেকে একটা পঞ্চায়েতের মেম্বার বা পাড়ার তৃণমূল নেতার ক্ষমতা অনেক বেশি। পুলিশ সেই পাড়ার তৃণমূল নেতার কথা শুনবে, কিন্তু তোমাকে পাত্তা দেবে না। বিডিও পঞ্চায়েত প্রধানকে দেখে উঠে দাঁড়াবে, কিন্তু তুমি গেলে সটান বলে দেওয়া হবে, 'ব্যস্ত আছি, দেখা হবে না।'

আগেকার যুগে একটা কথা চালু ছিল, ধোপা নাপিত বন্ধ। এ অনেকটা সেরকম ব্যাপার।

তুমি শাসকদলকে হারিয়ে জিতেছো? অতএব, তোমার ধোপা নাপিত বন্ধ। দু'মাসেই বেচারা বায়রন যেন হাঁফিয়ে উঠেছেন। কে চায় এই দমবন্ধ করা আবহে থাকতে। তার থেকে বাবা পতাকা হাতে তুলে নাও। 'অনুপ্রেরণা'য় সামিল হয়ে যাও। সেই ঢের ভাল। বায়রন ঠিক সেটাই করেছেন। নিজের এলাকায় কী করে আর অন্য দলের পতাকা তুলে নেন! তার থেকে বরং ঘাটালে ছুটে যাওয়া অনেক ভাল। এলাকার লোকে যা জানার, টিভিতেই জানুক। বিক্ষোভ-টিক্ষোভ দু-একদিন থাকবে। দু-একদিন ফেসবুকে একটু খিল্লি হবে। তারপর সবাই ভুলে যাবে। কারণ, দলবদল এখন আর কাউকে অবাক করে না। রাগ বা ঘৃণা তৈরি করে না। সর্বগ্রাসী শাসকদলের দৌলতে এটা এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এত লোকের দলবদল যখন বাঙালি নির্বিঘ্নে হজম করেছে, আরেকটা হজম করতেও বাঙালি সময় নেবে না।

অনেকেই বায়রনকে গাল পাড়ছেন। কেউ বলছেন গদ্দার, কেউ বলছেন মিরজাফর, কেউ বলছেন বিশ্বাসঘাতক। ঘুরে ফিরে সেই একই প্রতিশব্দ। শুধু শুধু বায়রনকে গালাগাল দিয়ে আর কী হবে? তিনি তো নেহাত পরিস্থিতির শিকার। টাকার লোভে বায়রন দল বদল করেছেন বলে মনে হয় না। হ্যাঁ, তিনি ব্যবসা করেন। শাসকদলকে চটিয়ে সেই ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া কঠিন। পদে পদে বাধা সৃষ্টি করতে সত্যিই এঁদের কোনও জুড়ি নেই। মিথ্যে কেস, মিথ্যে মামলা, হুমকি— এসব তো

আছেই। মূলস্রোতে থাকলে অন্তত এসব ঝক্কি পোহাতে হবে না। এই নিশ্চয়তাটুকুই হয়ত তিনি চেয়েছিলেন। আর যদি মন্ত্রীত্ব বা কোনও পদ জুটে যায়, সেটা হবে বাড়তি পাওনা।

কিন্তু দলবদল করতে গিয়ে যুবরাজের পাশে বসে বায়রন কী বললেন, সেটা অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বললেন, 'বিরোধী বিধায়ক হয়ে কাজ করতে পারছিলাম না।' ছোট্ট একটা কথা। আপাতভাবে খুবই নিরীহ। তাঁর কাজের পথে বাধাটা কে? এমন তো নয় যে কংগ্রেস বা বিজেপি বা সিপিএম তাঁকে কাজ করতে দিচ্ছে না। বায়রন বুঝিয়ে দিলেন, এখানে বিরোধী বিধায়কদের ন্যূনতম পরিসরটুকু নেই। ন্যূনতম সম্মানটুকু নেই। প্রশাসন বিরোধী বিধায়ককে পাত্তাই দেয় না। পদে পদে হেনস্থা করে। খোদ যুবরাজের পাশে বসে বুঝিয়ে দিলেন রাজ্যটা আসলে কেমন চলছে।

তাই বায়রনকে গালাগাল নয়। বরং অভিনন্দন জানান। ভাইপোর পাশে বলে এমন নির্লজ্জ সত্যিটা বলতে পেরেছেন। সরকারের গালে এর থেকে বড় থাপ্পড় আর কী হতে পারে!

বিশ্বাসের সিংহাসন থেকে জাস্টিস গাঙ্গুলিকে কে সরাবে!

স্বরূপ গোস্বামী

আমরা একই শহরের নাগরিক। কিন্তু কখনও আপনাকে চোখে দেখিনি। মানে, সামনাসামনি দেখিনি। অদূর ভবিষ্যতে দেখা হবে, এমন সম্ভাবনাও প্রায় নেই বললেই চলে।

তবু আপনি আমার অচেনা নন। বেশ চেনা চেনাই মনে হয়। আরও একধাপ এগিয়ে বললে, বেশ আপনজনই মনে হয়। শুধু আমার কেন, এভাবেই গত একবছরে আপনি লক্ষ লক্ষ মানুষের আপনজন হয়ে উঠেছেন।

এমনিতেই হাইকোর্টের বিচারপতিদের সঙ্গে গড়পড়তা সাধারণ মানুষের একটা দূরত্ব থেকেই যায়। তাঁরা কোনও সভা সমিতিতে যান না। তাঁদের কাছেও অন্যরা যেতে পারেন না। টিভি বা কাগজে তাঁদের কথা কতটুকুই বা বেরোয়! সত্যি বলছি, এক বছর আগেও অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলে কোনও বিচারপতির নামই শুনিনি।

আপনার আগেও কলকাতা হাইকোর্টে দিকপাল সব বিচারপতিরা এসেছেন। একের পর এক রায় দিয়ে গেছেন। কখনও সরকারকে কড়া তিরস্কারও করে গেছেন। তখন তাঁদের নিয়ে এক-দু দিন হইচই হয়েছে। নিমেশে, সেসব থেমেও গেছে। কারণ, তাঁরাও মাঝে মাঝে ফোঁস করেছেন। আবার শীতঘুমে চলে গেছেন। যথারীতি মামলা 'তারিখ পে তারিখ' নিয়ম মেনে হিমঘরে চলে গেছে।

কিন্তু আপনি লোকটা একেবারেই অন্য

ধাঁচের। সিবিআই তদন্ত দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। লেগে রইলেন। তদন্তের গতিপ্রকৃতি কোনদিকে এগোচ্ছে, নজর রাখলেন। মাঝে মাঝেই সিবিআই-কে ধমক দিলেন। কড়া তিরস্কার করলেন। বুঝিয়ে দিলেন, আসল পান্ডাকে ধরার কোনও সদিচ্ছাই সিবিআইয়ের নেই। বুঝিয়ে দিলেন, মামলা অনন্তকাল ধরে চলবে, তা হতে পারে না। দ্রুত তদন্ত শেষ করতে হবে। দ্রুত বিচারপ্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। এক কলমের খোঁচায় শয়ে শয়ে চাকরি নস্যাৎ করে দিলেন।

মৌচাকে ঢিল মেরেছেন মশাই। কেন সারদা, নারদা তদন্তে সিবিআই অশ্বডিম্ব প্রসব করল, আপনি বেশ ভালই জানেন। কেন এক্ষেত্রেও সিবিআই একটা সময়ের পর গিয়ে থমকে যাচ্ছে, সেটাও আপনার থেকে ভাল কে জানে! তারা কয়েকটা ভুঁইফোড় এজেন্টকে ধরে। সেই ধুরন্ধর এজেন্টরা হাওয়ায় এক-দুজন মহিলার নাম ভাসিয়ে দেয়। ব্যাস, ওই নিয়েই মেতে থাকে মূলস্রোত মিডিয়া। আসল মাথাকে আড়ালে রাখতে যা যা করা দরকার, সিবিআই সেটাই করে চলেছে।

আপনিও সবকিছুই বুঝতে পারছেন। কিন্তু চেয়ারে বসে তো আর সবটা বলা যায় না। যেটুকু বলা যায়, সেটুকু হজম করাই কারও কারও কাছে বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ওপর তলায় তাঁরা অনেকটাই ম্যানেজ করে ফেলেছে। সিবিআই-কেও শীতঘুমে পাঠিয়ে দিতে সময় লাগবে না। কিন্তু যত নষ্টের গোড়া আপনি। আপনার জন্যই এইসব ধেড়ে ইঁদুরেরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারছে না।

যেভাবেই হোক, আপনাকে সরাতে হবে। এখনই পৃথিবী থেকে সরানো মুশকিল। চেষ্টা হবে অন্য কোনও হাইকোর্টে বদলি করার। তারই প্রথম ধাপ হল, দুটো মামলা

আপনার বেঞ্চ থেকে সরিয়ে নেওয়া। যে সুপ্রিম কোর্ট ডিএ মামলা মাসের পর মাস ঝুলিয়ে রাখে, সেই সুপ্রিম কোর্ট এক্ষেত্রে কত তৎপর! আপনাকে সরিয়ে দিতে পনেরো দিনও লাগল না। নিশ্চিত থাকুন, এইসব বিচারপতিরা অবসরের পরই ঠিক প্রোমোশনাল পোস্টিং পেয়ে যাবেন। হয় রাজ্যসভার সদস্য হবেন, নয়তো রাজ্যপাল হবেন, নিদেনপক্ষে কোনও না কোনও কমিশনের মাথায় বসবেন।

আপনি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন বলে কি এত গাত্রদাহ! মোটেই না। সেটা তো অজুহাতমাত্র। সেই সাক্ষাৎকারে আপনি একটা মারাত্মক কথা বলেছেন, যেটা নিয়ে কোনও আলোচনা হচ্ছে না। আপনি বলেছেন, অবসরের পর আপনি কোনও পোস্টিং নেবেন না। এতবড় একটা কথা তো এর আগে কোনও বিচারপতিকে বলতে শুনিনি। তাই রাম মন্দির, কাশ্মীর, নোটবন্দি সংক্রান্ত রায় দিতে গিয়ে যাঁরা শাসকের হুকুম তামিল করেছেন, তাঁদের কেউ রাজ্যপাল, কেউ সাংসদ হয়ে গেছেন। এখন যাঁরা একের পর এক মামলায় রাজ্য সরকারকে স্বস্তি দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছেন, কেন্দ্রের সবুজ সংকেত ছাড়া তাঁরা এইসব সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারতেন! কিন্তু এই সহজ অঙ্কগুলো এই দেশের লোকেরা সহজে বোঝে না।

কিন্তু রাজ্যের বেশিরভাগ মানুষ এই সত্যিটুকু বোঝেন, এই একজন মানুষ আছেন, যিনি এখনও লড়াইটা লড়ে যাচ্ছেন। যিনি এত সহজে লড়াই থেকে পিছিয়ে যাবেন না। যিনি বিক্রি হয়ে যাবেন না। এমনকী, তৃণমূলের লোকেরাও অন্তত পিসি বা ভাইপোর থেকে আপনাকে বেশি বিশ্বাস করে।

তাই, আপনার হাত থেকে মামলা সরে যাচ্ছে শুনলে ধর্মতলায় ধর্নায় বসা চাকরি প্রার্থীরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। পাড়ার রকে আড্ডা দেওয়া ছেলেরাও কোথাও একটা মুষড়ে পড়ে। কেউ ফেসবুকের দেওয়াল ভরিয়ে দেয়। কেউ একা একা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। হ্যাঁ, জাস্টিস গাঙ্গুলি, এত এত মানুষের আস্থা আপনি অর্জন করেছেন।

এরপরেও নানা টালবাহানা চলবে। আপনাকে অপদস্থ করার নানা চেষ্টা বজায় থাকবে। হয়ত মামলার গতি শ্লথ হয়ে আসবে। হয়ত সুপ্রিম কোর্টের কেউ কেউ এইসব আপাদমস্তক দুর্নীতিতে ডুবে থাকা ধেড়ে ইঁদুরদের ত্রাতা হয়ে উঠবেন। সময়ের নিয়মে আপনি হয়ত অবসরের বৃত্তে পৌঁছে যাবেন। কিন্তু তারপরেও উজ্জ্বল হয়ে থেকে যাবে এই নামটা।

হ্যাঁ, এই নামটাকে বাঙালি বড্ড ভাল বেসে ফেলেছে। বড্ড বিশ্বাস করে ফেলেছে। সেই ভালবাসা ও বিশ্বাসের সিংহাসন থেকে আপনাকে সরানোর ক্ষমতা ওই কীর্তিমানদের নেই, এমনকী সুপ্রিম কোর্টেরও নেই।

মিডিয়া সমাচার

সমরেশ, আপনার মৃত্যু আমাদের আরও লজ্জিত করে গেল

ঈশ্বর গুপ্ত

তখন টিভিতে রাজনৈতিক তরজা চলছিল। হঠাৎ, পর্দায় ভেসে উঠল, সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার প্রয়াত। হ্যাঁ, বয়স হয়েছিল। শারীরিক নানা সমস্যাও ছিল। হাসপাতালে ভর্তিও ছিলেন। তবু এমন একটা খবরের জন্য বাঙালি বোধ হয় প্রস্তুত ছিল না।

কিন্তু এমন একটা খবর যদি হঠাৎ করে এসে যায়, কী আর করা যাবে! এবিপি আনন্দ, যাঁদের আর্কাইভ ঈর্ষণীয়, সেখানেই চোখ রাখা। কিন্তু তাতে বেশ হতাশই হলাম। একই কথার পুনরাবৃত্তি। এঁকে-তাঁকে ফোনে ধরা। গতানুগতিক শোকপ্রকাশ। কিন্তু এরপরের দু'ঘণ্টা ধরে যা দেখে গেলাম, তাতে রাগ ও বিরক্তি আরও বাড়ল।

আর্কাইভ খুঁজে অবশেষে কিছু একটা পাওয়া গেছে। এবিপি আনন্দের 'সেরা বাঙালি' অনুষ্ঠান। সেখানে সমরেশ মজুমদারকে একবার সম্মানিত করা হয়েছিল। পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন জয় গোস্বামী। আর সেই পুরস্কার গ্রহণ করছেন সমরেশ মজুমদার। নানা সময়ে দৃশ্যটা অন্তত বার চল্লিশেক দেখানো হল। যেন সমরেশ মজুমদার নামটার আর কোনও গুরুত্ব নেই। শুধুই এবিপি আনন্দ তাঁকে 'সেরা বাঙালি' দিয়ে ধন্য করেছিল। এটাই তাঁর একমাত্র পরিচিতি।

এই হল এবিপি আনন্দের আর্কাইভ। এরকম একজন কিংবদন্তি সাহিত্যিকের কোনও ইন্টারভিউ আর্কাইভে পাওয়া যাচ্ছে না। কখনও কেউ মারা গেলে ফোনে দু-চার লাইনের প্রতিক্রিয়া নেওয়া হয়েছে। কখনও কোনও বিতর্কসভায় পাঁচ মিনিটের বক্তৃতা দিতে ডাকা হয়েছে। এর বাইরে আলাদা করে এই মানুষটার একটা ইন্টারভিউ করি, এমন তাগিদ কখনও দেখা যায়নি। অথচ, শোভন-বৈশাখির নাচের বা খেউড় করার ফুটেজ বলুন, অন্তত একশো খানা ফুটেজ নিমেশে বেরিয়ে যাবে।

কিন্তু সমরেশ মজুমদারদের ফুটেজ আর্কাইভ ঘেঁটে পাওয়া যায় না। অথচ, বাংলাদেশের বিভিন্ন চ্যানেলে কিন্তু তাঁর ইন্টারভিউ পাওয়া যাবে। যখনই সেই দেশে গেছেন, সেই দেশের প্রথমসারির চ্যানেলগুলো দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়ে রেখেছে। সেগুলো যত্ন করে পরিবেশন করেছে। আর আমাদের এই বাংলার চ্যানেলে তাঁকে পাওয়া যায় না।

একটা মৃত্যু আমাদের তথাকথিত নিউজ চ্যানেল গুলোর দৈন্যদশা আরও একবার প্রকট করে দিয়ে গেল।

পানশালা উদ্বোধনই এখন ইস্টবেঙ্গলের মেগা ইভেন্ট

অজয় নন্দী

আগের মরশুমে আইএসএলে ইস্টবেঙ্গল কত নম্বরে ছিল? তার আগেরবার? একেবারে শেষ সারিতে ইস্টবেঙ্গলের স্থান বরাদ্দ।

সামনের মরশুমের দল গঠন নিয়ে এখনও বিরাট কিছু অগ্রগতি হয়েছে, এমন খবর নেই। এবারও ভাল মানের দল গঠন করা সম্ভব হবে না। প্রথমত, গত কয়েক বছরে এই যাদের ট্র্যাক রেকর্ড, সেখানে কোনও ভাল মানের ফুটবলার কেনই বা খেলতে আসবেন!

দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ ফুটবলারের সঙ্গেই সেই ক্লাবের দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি। সেই চুক্তি ভেঙে তাঁদের আনতে গেলে মোটা অঙ্কের ট্রান্সফার ফি দিয়ে আনতে হবে। এতখানি টাকা কি ট্যাঁকে আছে?

তৃতীয়ত, দল গঠনে সেই সদিচ্ছাটাও নেই। এখনও স্পনসর আর ক্লাবকর্তারা গ্যালারি শোয়েই ব্যস্ত। একদল আরেক দলকে চিঠি লেখে, সেই চিঠি পৌঁছনোর আগেই মিডিয়ার কাছে পৌঁছে যায়।

এমনকী কোন কোন প্লেয়ার চাই, সেই লিস্টও ফাঁস হয়ে যায়। ক্লাব কর্তারা সেগুলো দায়িত্ব নিয়ে ক্লাবের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে আপলোড করেন। নিম্নস্তরের এই ভাঁড়ামি দিনের পর দিন চলে আসছে।

একেবারে সাম্প্রতিক সংযোজন। ক্লাবে সদস্যদের বসার জন্য জমকালো ব্যবস্থা হল। এই আকালের বাজারে এটাই যেন মেগা ইভেন্ট। সেইসঙ্গে ধুমধাম করে চালু হয়ে গেল বার। মানে, পানশালা। আর সেসবের উদ্বোধন করলেন কে? সর্বঘটে কাঁঠালি কলা রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী। নিজের কাজে অষ্টরম্ভা। বার উদ্বোধন করে সেই ছবি ছাপিয়েই তিনি ধন্য। ছবির কাঙ্গাল ক্রীড়ামন্ত্রী সবকিছুর মধ্যেই ছবির আইটেম খোঁজেন। তাই সেলিব্রিটি দেখলেই হ্যাংলার মতো নিজের মুখ বাড়িয়ে দেন। সত্যিই তো, বার উদ্বোধনের জন্য এমন 'নিষ্কর্মা' মন্ত্রীর চেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি আর কেই বা হতে পারতেন!

ক্লাবকর্তাদেরও ধন্য। গত দু'বছরে সীমাহীন ব্যর্থতা। এ বছরও দল গঠন বিশ বাঁও জলে। তারপরেও কেউ ঘটা করে বার উদ্বোধন করতে পারে! এমন অপদার্থ কর্তারা থাকলে এর চেয়ে ভাল কিছু আশা করাও যায় না। কিন্তু কর্তারা এই স্তরের ভাঁড়ামি দিনের পর দিন করে যাচ্ছেন কোন ভরসায়? কারণ, তাঁরা জানেন, সমর্থকদের দৌড় ওই ফেসবুক পর্যন্ত। তাঁদের যত বিপ্লব, ফেসবুকেই। আর মূলস্রোত মিডিয়া। সেলফি তোলায় ব্যস্ত মূলস্রোত বঙ্গজ মিডিয়া দন্ত বিগলিত করে সেলফি তোলাতেই আনন্দ পায়। এঁদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। 'বার' এ একটু ডিসকাউন্ট দিলেই এঁরা ধন্য ধন্য রব তুলে দেবেন।

হেমন্ত স্মরণে ই-ম্যাগাজিন

আগামী ১৬ জুন কিংবদন্তি শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।

লকডাউনের আবহে নিঃশব্দে পেরিয়ে গেছে তাঁর জন্ম শতবর্ষ। জন্য কোনও অনুষ্ঠান তো দূরে থাক, অনেকে জানতেও পারেননি। টিভি ও কাগজগুলিও অদ্ভুতভাবেই নীরব ছিল। না ছিল আলাদা ম্যাগাজিন। না ছিল ক্রোড়পত্র।

এখন জীবন আবার স্বাভাবিক স্রোতে। কিন্তু তারপরও তাঁর জন্মদিন হয়ত নিঃশব্দেই পেরিয়ে যাবে। মূলস্রোত কাগজ বা ম্যাগাজিন খুব একটা উদারতা দেখাবে বলে মনে হয় না। জন্মদিনের দিন হয়ত একটা বা দুটো লেখা থাকবে। হয়ত সকাল থেকে ফেসবুকে কিছু ছবি।

কিন্তু তার বাইরেও আরও অনেক কিছু করার থাকে। হেমন্তকে নিয়ে কত অজানা কথা। সেইসব অজানা কাহিনি পাঠকের কাছে তুলে ধরাই যায়। একটু অন্যভাবে এই কিংবদন্তি শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানানোই যায়। বেঙ্গল টাইমস তার সীমিত সামর্থ্য নিয়ে এগিয়ে এসেছে। হেমন্তর জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হবে বিশেষ হেমন্ত সংখ্যা।

প্রিয় পাঠক, এখানে আপনিও লিখতে পারেন। উঠে আসুক হেমন্তর জীবনের নানা অধ্যায়। নির্দিষ্ট কোনও দিকে আলো ফেলুন। প্লিজ, উইকিপিডিয়া দেখে জীবনী বা তথাকথিত 'রচনা' লিখে পাঠাবেন না।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা:
bengaltimes.in@gmail.com

দু'হাজারি নোটের আত্মকথা

স্বরূপ গোস্বামী

আমার দিন ফুরালো। সবারই নাকি একটা এক্সপায়ারি ডেট থাকে। ধরে নিন, আমার সেই তারিখ এসে গেছে।

আমার আসার সময়টাও ছিল বড় অদ্ভুত। চলে যাওয়ার সময়টাও তাই। সালটা ২০১৬। নভেম্বরের কোনও এক সন্ধেবেলায় হঠাৎ করে ঘোষণা হল, এখন থেকে পাঁচশো আর হাজার টাকা বাতিল। এগুলির আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। দেশজুড়ে যে কী ভয়াবহ অবস্থা। ব্যাঙ্কের সামনে দীর্ঘ লাইন। যার কাছে যত পাঁচশো বা হাজারের নোট আছে, সব জমা দিতে হবে। সরকার বদলে নেওয়ার জন্য দু'মাসের সময় দিয়েছিল। কিন্তু পাবলিক বুঝলে তো! তাকে যেন আজকেই ব্যাঙ্কে ছুটতে হবে। আজকেই সব পাঁচশো–হাজার বদলে ফেলতে হবে। সে কী হুড়োহুড়ি!

কত লোকের কাজ চলে গেল। পরিযায়ী শ্রমিকেরা ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরে এলেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ

থেকে তখন রোজ নিত্যনতুন ঘোষণা। রোজ নিয়ম পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে। কোনও নিয়ম শিথিল হচ্ছে, কোনওটা আবার কড়া হচ্ছে। এমনই এক আবহে আমার জন্মবার্তা ঘোষণা হল। বলা হল, হাজার টাকার নোট আর ফিরে আসবে না। পাঁচশোর নোট আসবে, তবে অন্য চেহারায়। আত্মপ্রকাশ হচ্ছে দু'হাজার টাকার।

পাঁচশোর পর একেবারে একধাপে দু'হাজার। তার মানে, আমিই সবথেকে মূল্যবান। আমিই সবথেকে এলিট ক্লাসের। তখন আমাকে পায় কে! আমাকে নিয়ে নিমেশে কত গল্পও ছড়িয়ে গেল। আমার ভেতর নাকি চিপ লাগানো থাকবে। কোন দু'হাজার টাকার নোট কোথায় আছে, নিমেশে বেরিয়ে যাবে। কার ঘরে কটা দু'হাজারের নোট মজুদ আছে, সরকার নাকি ঠিক জানতে পারবে। অর্থাৎ, কালো টাকা গচ্ছিত রাখার দিন শেষ। কত তাবড় তাবড় অর্থনীতিবিদ আমাকে নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় বসে গেলেন। সন্ধের টিভি চ্যানেলজুড়ে আমার জয়জয়কার।

গোলাপি রঙের জামা গায়ে দিয়ে আমার আবির্ভাব। সবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ছেপে এসেছে। নতুন বইয়ের যেমন গন্ধ থাকে, নতুন নোটেরও বোধ হয় থাকে। একেবারে কড়কড়ে দু'হাজার। কেউ গন্ধ শুঁকছে। কেউ আমার সঙ্গে সেলফি তুলছে। কেউ আমাকে বালিসের তলায় রেখে ঘুমোতে যাচ্ছে। কেউ আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে। আমাকে নিয়ে যতরকম আদিখ্যেতা করা যায়, কোনও-টাই বাকি ছিল না।

কিন্তু সেই মোহ কাটতে সময় লাগল না। এটিএমে গেলেই আমি বেরিয়ে আসছি। এমনকী যে আড়াই হাজার টাকা তুলছে, তাকেও একটা দু'হাজারের নোট গছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দশ হাজার তুলতে গেলে পাঁচটা কড়কড়ে দু'হাজার। দেখতে বেশ লাগে। কিন্তু বাজারে গেলেই সে এক মস্ত বিড়ম্বনা। কোনও দোকানদার নিতে চাইছে না। কেনই বা নেবে! কেউ দেড়শো টাকার জিনিস নিয়ে যদি দু'হাজারের নোট দেয়, দোকানি বাকি সাড়ে আঠারোশো কোত্থেকে দেবে! ফলে, সে দু'হাজার দেখলেই হাতজোড় করে বলছে, দাদা, জিনিস নিতে হবে না। তবু ওই দু'হাজার নিতে পারব না। বেচারি ক্রেতা। সেই বা ছোট নোট পাবে কোথায়! এটিএমে তাকে তো ওই দু'হাজার গছিয়ে দিয়েছে। এই বড় নোট ছোট করার যে কী হ্যাপা, যারা জানে, তারাই জানে।

এভাবেই সম্পদ বদলে গেল আপদে। আরে বাবা, এই দেশটার সবাই তো আর টাটা-বিড়লা বা আম্বানি-আদানি নয়। তারা তো আর লাখ লাখ টাকার লেনদেন করে না। তাদের দিন-আনি, দিন-খাইয়ের রোজ নামচায় এই দু'হাজার এক মস্ত বিড়ম্বনা হয়েই দেখা দিল। হাতে এলে, কত-ক্ষণে ভাঙিয়ে ছোট নোট করা যায়, সেটাই যেন একমাত্র চিন্তা। এটিএমে গিয়ে লোকে ভুলেও

দু'হাজারের বেশি অঙ্ক লিখছে না। কারও তিন হাজার দরকার হলে সে দু'বার করে দেড় হাজার তুলছে। চার হাজার দরকার হলে, দেড়, দেড়, এক–এভাবে তিনবারে ভেঙে নিচ্ছে। মোদ্দা কথা, আমি অচ্ছুৎ, আমাকে ঘরে তোলা যায় না। তার ওপর আমার নকল হতেও সময় লাগল না। 'মহান' শিল্পীরা আমাকে হুবহু জাল করে বাজারে ছেড়ে দিল। দোকানিরা পড়ল আরও সমস্যায়। যদি জাল নোট হয়! এই আতঙ্কে আমার ছায়াই মাড়াতে চাইল না।

বলুন তো, এমন অচ্ছুৎ হয়ে কাঁহাতক আর থাকা যায়! বলা হয়েছিল, কালো টাকা রুখতে আমাকে বাজারে আনা হয়েছে। অথচ, যেখানে যতরকমের অনিয়ম, সেখানে আমার উপস্থিতি। যেখানে তল্লাশি হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, খাটের তলায়, বস্তার ভেতর থরে থরে দু'হাজারের নোট। অবৈধ লেনদেন মানেই যেন আমি। টিভিতে ফলাও করে সেইসব বাজেয়াপ্ত টাকার ছবিও দেখাচ্ছে। অর্থাৎ, যেখানে কালো টাকা, সেখানে আমি। একদিকে, আমজনতার কাছে আমি অচ্ছুৎ, অন্যদিকে কালো টাকার কারবারি দের কাছে আমি দিব্যি ঘাপটি মেরে আছি।

বলুন তো, এমন অচ্ছুৎ হয়ে থাকার জন্য, এমন 'কালো ধন' হয়ে থাকার জন্য কি আমার জন্ম হয়েছিল! বলি, আমার কি মানসম্মান বলে কিছু নেই! আমি সবথেকে দামী নোট। অথচ, এমন অসম্মান কি আমার প্রাপ্য ছিল! সরকারও হয়ত সেটা বুঝেছিল। তাই আর নতুন করে ছাপছিল না। এটিএমে দিচ্ছিল না। যা ব্যাঙ্কে ঢুকছিল, আর বেরোচ্ছিল না। বাজার থেকে আস্তে আস্তে ভ্যানিস হয়েই আসছিলাম। এবার সেই মৃত্যুঘণ্টা। যার কাছে যা দু'হাজা-রের নোট আছে, ব্যাঙ্কে জমা দিন। এবার অবশ্য অনেকটা সময়। ধীরে সুস্থে দিলেই হবে। তাই হুড়োহুড়ি নেই। তাছাড়া, অধিকাংশ লোক আমাকে আগেই ত্যাগ করেছে। তাদের মানি ব্যাগ থেকে, আলমারি থেকে আমি আগেই নির্বাসিত। তাই, তাদের কোনও টেনশনও নেই।

আমার এই মৃত্যু কোনও আকস্মিক মৃত্যু নয়। বলতে পারেন, অনেকদিন ধরেই ভেন্টিলেশনে ছিলাম। মৃত্যুর দিন গুনছিলাম। বিদায়বার্তাটা শুধু সময়ের অপেক্ষা ছিল। আমার বিদায়ে কারও কোনও দুঃখ নেই, কারও কোনও হাহুতাশ নেই, দেশজুড়ে কোথাও কোনও চাঞ্চল্য নেই, জাতীয় রাজনীতিতে তোলপাড় নেই। একেবারে নিঃশব্দ বিদায় বলতে যা বোঝায়, তাই।

সাড়ে ছয় বছরের আয়ু নিয়ে আমি এসেছি-লাম। মহাকালের কাছে সাড়ে ছয় বছর কী এমন সময়! সবাই একদিন ভুলেও যাবে। বলতেই পারতাম, 'আমি রব নিষ্ফলের, হতাশের দলে'। না, এতখানি হতাশ হতে রাজি নই। তাই সেই বিশ্বকবির ভাষাতেই বলি, 'আকাশেতে আমি রাখি নাই মোর/ উড়িবার ইতিহাস/ তবু উড়েছিনু/ এই মোর উচ্ছ্বাস'।

স্মার্টফোন থাকা মানেই সে স্মার্ট!

স্মার্টফোন অনেকেরই থাকে। থাকাটা অন্যায় নয়। কিন্তু যাঁরা সবসময় সেই ফোনে মুখ গুঁজেই আছেন, তাঁরা কি সত্যিই খুব স্মার্ট? বিদেশি গবেষণা কিন্তু অন্য কথা বলছে। সেই গবেষণার হদিশ দিলেন প্রসূন মিত্র।।

স্মার্ট মানে চালাক। কিন্তু যারা স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে তাঁদের অধিকাংশই আনস্মার্ট অর্থাৎ বোকা। বিদেশের তিনটি প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষা থেকে এমনই তথ্য জানা যাচ্ছে। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় আলাদা আলাদা সমীক্ষা চালালেও ফলাফল মোটামুটি এক। তার সারকথা হল, যে যত বড় হাঁদা গঙ্গারাম সে তত বেশি স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে।

তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে Rice University যৌথভাবে সমীক্ষা চালিয়েছিল US Airforce এর সঙ্গে। সমীক্ষায় জানা গেছে, স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারীরা বুদ্ধির দিক থেকে পুরোপুরি যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তাদের ধারণা, ফোন তাদের সব কিছু বলে দেবে। তারা এতটাই বোকা যে মানচিত্র দেখে কোন জায়গা চিনতে পারেন না।

University of Waterlooর সমীক্ষাতেও একই ফলাফল। ৬৬০ জনের ওপর পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে এসেছে, যারা দিনরাত মোবাইল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন, তাঁদের জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তা স্বাভাবিকের থেকে কম।

আরও মারাত্মক তথ্য উঠে এসেছে Psychology Today পত্রিকায়। মনস্তত্ত্বের বিখ্যাত এই পত্রিকা স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারীদের কিছু প্রশ্ন করেছিল। কিন্তু প্রশ্নোত্তরের আগে তাদের হাত থেকে ফোন নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। পত্রিকাটি জানাচ্ছে, এই ব্যক্তিরা এতটাই বোকা যে, 'কোন দুটি সংখ্যা যোগ করলে ৩ হয়?' এই জাতীয় সহজ প্রশ্নের উত্তরও মবাইলের সাহায্য ছাড়া দিতে পারেননি।

University of Essex এর সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারীরা মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন না। মার্কিন গবেষক David Wygnat এর মতে, মানুষের বাস্তববোধ বৃদ্ধি পায় অভিজ্ঞতা থেকে। যে যত বেশি মানুষের সঙ্গে মেশে, তার অভিজ্ঞতা তত বেশি। স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারীদের এই অভিজ্ঞতা একেবারেই কম। কারণ ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফলে তারা কারও সঙ্গে মেশার সময় পায় না।

কলকাতার এক মনোবিজ্ঞানীর দাবি, পৈতে দেখে যেমন বামুন চেনা যায়, তেমনই দিনরাত স্মার্ট ফোনে মুখ গুঁজে থাকা ব্যক্তিকে খুব সহজেই গবেট বলে চিনে নেওয়া যায়।

স্বীকারোক্তি

স্কুল ম্যাগাজিনে না দেওয়া সেই লেখা

ছোট ছোট ভুল অনেক সময় বারবার মনে পড়ে যায়। অনেক বছর পেরিয়ে গেলেও ভোলা যায় না। তেমনই একটি ভুলের কথা বলে হয়ত কিছুটা হালকা হতে পারব। তখন বোধ হয় ক্লাস নাইনে পড়ি। ক্লাসে নোটিশ দেওয়া হল, স্কুল ম্যাগাজিন বেরোবে। যারা যারা লেখা দিতে চায়, তাদের সাত দিনের মধ্যে লেখা দিতে হবে।

আমি বোধহয় সেই বিরল বাঙালিদের একজন, যে সারা জীবন একটিও কবিতা লেখেনি। তাই আমার লেখা দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু আমার বন্ধু দেবরাজ আমাকে একটি কবিতা দিয়েছিল। সে জ্বরের জন্য কয়েকদিন স্কুলে যেতে পারেনি। এক বন্ধুর কাছে লেখা দেওয়ার কথা শুনেছিল। দেবরাজ আমাকে বলল, তুই তো স্কুলে যাচ্ছিস। এই লেখাটা বাংলার স্যারকে দিয়ে দিস। আমি যথারীতি লেখাটা দিতে ভুলে গেলাম। তিনদিন পর মনে পড়ল। তখন আর লেখাটা খুঁজেও পেলাম না। কী জানি, কোথায় হারিয়ে ফেলেছি। দেবরাজ লেখাটার ব্যাপারে আমাকে আর জিজ্ঞাসাও করেনি।

ম্যাগাজিন বেরোলো। তাতে দেবরাজের লেখা নেই। থাকার কথাও ছিল না। দেবরাজ ভেবেছিল, ওর লেখা হয়ত স্যারের ভাল লাগেনি। তাই ছাপা হয়নি। হয়ত মনে মনে স্যারের প্রতি রাগও হয়েছিল। কিন্তু আমি যে লেখাটা জমাই দিইনি, সেটা ওকে জানাতেও পারিনি। সেই ভুলের বোঝা আজও বয়ে বেড়াচ্ছি। দেবরাজ, সেদিনের সেই ভুলের কথা এতদিন পর তোর কাছে স্বীকার করছি। ওটাকে ভুল হিসেবেই দেখিস। বিশ্বাস কর, সেই ভুলটা ইচ্ছাকৃত ছিল না।

সজল চক্রবর্তী,
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

(স্মৃতিটুকু থাক। পাঠকের মুক্তমঞ্চ। এখানে ফেলে আসা জীবনের অনেক স্মৃতি উজাড় করে দিতে পারেন। অনেকদিনের লুকিয়ে রাখা কোনও ভুল স্বীকার করে নিজের মনকে কিছুটা হালকাও করতে পারেন। লিখে পাঠানা আপনার অনুভূতির কথা)

বিনোদন

থ্রিলার আছে, রহস্যও আছে কিন্তু রাজনীতিটাই নেই

স্নেহা সেন

পোস্টারে কৌশিক গাঙ্গুলির নাম বা ছবি মানে একটা অন্যরকম বার্তা। হ্যাঁ, এই ছবি দেখা যায়। যদি তিনি পরিচালনায় থাকেন, তাহলে তো যায়ই। এমনকী যদি অভিনয়ে থাকেন, তাও দেখা যায়।

কদিন ধরেই নানা প্রান্তে পোস্টার চোখে পড়ছে। এমনকী সোশ্যাল সাইটেও ঘোরাফেরা করছে। রাজনীতি। না, ঠিক পূর্ণাঙ্গ ছবি নয়। ওয়েব সিরিজ।

হইচইয়ের সাবস্ক্রিপশন নেওয়াই ছিল। ফলে, দেখতে বাধা ছিল না। কিন্তু ঠিক সময় করে উঠতে পারছিলাম না। অবশেষে, দেখা হল। কেমন লাগল? এককথায় বলা মুশিকল। আসলে, এই ছবি দেখে আপনি খুব উচ্ছ্বসিত হবেন, এমনও নয়। আবার ‘ধুর ছাই, দেখা যায়

না' বলে মুখও ফেরাবেন না।

রাজনীতি আসলে একটি পলিটিক্যাল থ্রিলার। রাজনীতি যত না আছে, খুন–রহস্য তার থেকে বেশি আছে। শুরুই হচ্ছে একটি দুর্ঘটনাকে ঘিরে। একটি ট্রাক এসে সজোরে ধাক্কা মারল একটি গাড়িকে। সেই গাড়িতে ছিলেন সাংসদের মেয়ে। সঙ্গে আরেকজন। সে কে? এই প্রশ্নটাই তাড়িয়ে বেড়াল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। কিনারা যদিওবা হল, বিস্তর ধোঁয়াশা থেকেও গেল।

এই সাংসদ কৌশিক গাঙ্গুলি। তাঁর আচার আচরণে এক স্নেহপরায়ণ বাবা যেমন আছেন, তেমনই আছেন এক ক্ষমতালোভী নেতা। যিনি তাঁর পথের কাঁটাগুলোকে সরিয়ে ফেলতে গিয়ে নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়েন। যিনি তাঁর মেয়েকে নিজের শূন্য আসনে বসাতে চান। আপাতভাবে তাঁকেই খলনায়ক মনে হতে পারে। কিন্তু যত জট খুলতে থাকে, দেখা যায় তিনি নেহাতই মামুলি। আসলে কলকাঠি নাড়ছে অন্যরা। কৌশিকের অভিনয়ে নানা অভিব্যক্তি বেশ বিশ্বাসযোগ্যভাবেই ধরা দিয়েছে। মেয়ের ভূমিকায় দিতিপ্রিয়াও বেশ নজরকাড়া। মেয়ের বন্ধু হিসেবে অর্জুন মানানসই।

তবে চিত্রনাট্যে হিন্দি ছবির আদল আনার চেষ্টা বাস্তব থেকে কিছুটা হলেও দূরে সরিয়ে দিয়েছে। বাংলার রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে এই ছবি সেভাবে খাপ খায় না। তাছাড়া, ছবিতে দেখানো হয়েছে, গ্রামীণ এলাকার সাংসদ। স্বভাবতই গ্রামীণ জনজীবনও কিছুটা উঠে এসেছে। কিন্তু জেলায় একজন সাংসদের নির্বাচনী ক্ষেত্র কতটা বড় হয়, সে সম্পর্কে ধারণা থাকলে চিত্রনাট্য একটু বিশ্বাসযোগ্য হতে পারত। সাংসদের কাজের ক্ষেত্র কী, সে সম্পর্কেও কিছু ধারণা থাকা দরকার ছিল। কেন্দ্রীয় চরিত্রে একজন সাংসদ, ছবির নাম রাজনীতি, সেক্ষেত্রে আরও গভীরে যাওয়া দরকার ছিল। ভাসা ভাসা ধারণা নিয়ে এত ওপর থেকে না দেখলেই ভাল হত।

কাব্যে উপেক্ষিতা

নয়ের দশকের চুমকি যেন বাংলার আশা পারেখ

প্রজ্ঞাদীপা হালদার

এক পৃথিবী ছিল, যেখানে মেয়েদের নাম হতো পূর্ণিমা। আজকালকার অয়নাংকশী, দেওয়ান্বিতা এইসমস্ত নাম যা আমার কীবোর্ড অব্দি টাইপ করতে চায় না, এই যুগে বোধহয় খুব কম মেয়ের নামই পূর্ণিমা হয়। চুমকিও বোধহয় নাম হয় না ।

আমাদের সেই পুরনো প্রাচীন পৃথিবীতেই এমন নায়িকা হতেন। ভাইটাল স্ট্যাট নেহাৎই বাংলার মাটি সঙ্গাত। কোমরে মেদ, গাল ফোলা। মাথায় পাতাকাটা চুল, ছাপার শাড়ি। একটা সময় পর্যন্ত বাঙালি মেয়েদের এমনটাই দেখতে ছিল। চুমকি চৌধুরির বাবা সিনেমা বানাতেন বলেই নাকি উনি সিনেমায় চান্স পেতেন এমন শোনা যায়। মধ্যবিত্ত শেষ প্রজন্মের প্রিয় ছিলেন চুমকি চৌধুরি। প্রতি শুক্রবার সরমা আর লালীতে রমরমিয়ে সিনেমা আসতো বড় বৌ, মেজো বউ। সেই সব একটানা লাল সিনেমাহলগুলো আর নেই, ফ্ল্যাট উঠে গেছে।

নায়িকার নায়িকাত্ব ঘুচে যায় দয়িতের ভুজবন্ধনে চক্ষুমুদে পড়ে থাকার বদলে

সে যদি চৌচাপটে চড় হাঁকায় কাউকে। ভাবা যায় না বাঙালি সংস্কৃতির এপিটোম রবীন্দ্রনাথের নায়িকারা বা সত্যজিতের নায়িকারা কাউকে মারধোর করছে। অবশ্য চড় কষিয়ে নিজের ঘাড়ে নিজেই মুখ লুকিয়ে কেঁদে নেওয়া সে ভীষণ মেয়েলি, ঋতুপর্ণের ছবিতে আছে, আছে মারার পরেকার ক্লান্তি ও বিষাদ। সরোজ বন্দোপাধ্যায় বলেছেন আসলে আমরা নায়িকা হিসেবে খুঁজি শৈবলিনীর মতো সুন্দরী, কুন্দের মতো করুণ, সুচরিতার মতো রিজার্ভড, এবং কুমুর মতো ইমোশ-নাল একজনকে । সত্যিই তাই। এ কারণেই আমাদের সকল নায়িকা সম্ভাষণ ব্যর্থ । ‘এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর’ বলতে গেলে যা প্যাশনের প্রয়োজন চুমকি চৌধুরির তা দিব্য ছিল। বাংলা সিনেমাতে তার আগে কিল খেয়ে কিল চুরি করা মেয়েদেরই প্রাদুর্ভাব।

অশ্রুসজল সামাজিক ছবিতে বাড়ির হককথা বলা কাজের মেয়ে, নির্যাতিত মেজো বউ বা কর্তব্যনিঠ নার্সের ‘রোল’ করতেন চুমকি। তার পর আস্তে আস্তে পৃথিবী বদলাল। সৌন্দর্যের একটি গ্লোবাল উদাহরণ সেট হল। ভেজা ঠোঁট, সরু কোমর, পীবরস্তনী নায়িকারা সমস্ত রঙিন পোস্টারের দখল নিলেন। চুমকি বহুদিন ছবি করেন না মনে হয়। করলেও আমি দেখিনি। চুমকি বাঙালির আশা পারেখ।

সাদা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে বাবাকে বলেন, আমি অমুকের সঙ্গে বাইরে যাচ্ছি। বলে প্রায়ান্ধকারে রাখা একটি সাদা অ্যাম্বাসাডারের দিকে হেঁটে চলে যান। ফিরে আসেন কি না জানা নেই। এই অ্যাম্বাস্যাডর, এই সিনেমাহল, এই নায়িকা, সিনেমায় নিম্নবিত্ত পরিবারের ভিজে কলতলা সবই একটা হারিয়ে যাওয়া সভ্যতার চিহ্ন।

চুমকি চৌধুরি প্রিয় নায়িকা একথা কেউই আজকাল বলবেন না। বাংলা ছবির ইতিহাস লেখা হলে চুমকির মতো অনেক নায়িকা অকথিত থেকে যাবেন। কারণ, তাঁরা ক্লাস নন মাস। ইটস নট সো কুউউউল। আমিও বলব না শিওর। কিন্তু পর্দায় নয়ের দশকের নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি মেয়েদের শ্রেণি প্রতিনিধিত্ব করতেন চুমকি। যা আদপেই ঝাঁ চকচকে নয়, অথচ বিনোদনের গুরুত্বকে স্বীকার করতে বাধ্য করায়।

মনে মনে চুমকিকে আয়েষার রোল দিয়ে দিই। বঙ্কিমী প্যাশনের এমন নায়িকা, আর কেউ ছিলেন না। এখনও নেই।

ঠোঁটে কফি, চোখের সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘা

নীলাঞ্জন হাজরা

নিঃশব্দেই পেরিয়ে গেছে শতবর্ষ। কেউ জানতেও পারেনি। জানবে কী করে? তখন যে গুরুংবাবুদের ফতোয়ায় পাহাড়ে ওঠাই প্রায় নিষেধ ছিল। পর্যটকের ভীড় থাকলে হয়ত সেলিব্রেশন হত। কিন্তু ফাঁকা পাহাড়ে কে আর সেলিব্রেশন করতে যাবে!

কথা হচ্ছে কেভেন্টার্স রেস্তোরাঁ নিয়ে। হ্যাঁ, দার্জিলিংয়ের সেই কেভেন্টার্স, যার পথ চলা শুরু ১৯০৯ সালে। কেভেন্টার্সের কথা প্রথম বলেছিল সৌম্য। যদি আবার দার্জিলিং যাও, অবশ্যই ক্যাভেন্টার্সে যেও। না গেলে দার্জিলিং যাওয়াটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

তার আগে বার তিনেক দার্জিলিংয়ে গিয়েছি। কিন্তু সত্যি বলছি, তার আগে কেভেন্টার্সের কথা কেউ বলেনি। তাই যাওয়াও হয়নি। সেখানে কার পা পড়েনি? সত্যজিৎ রায় থেকে ঋত্বিক ঘটক। অমিতাভ বচ্চন থেকে রাজেশ খান্না। এডমন্ড হিলারি থেকে তেনজিং নোরগে। এতলোক যখন গিয়েছেন, তখন নিশ্চয় দামও আকাশছোঁয়া হবে। সে এক পাঁচতারা এলাহি ব্যবস্থা হবে। ভয়মিশ্রিত একটা রোমাঞ্চ নিয়েই গিয়েছিলাম।

কিন্তু গিয়ে ভুল ভাঙল। খোলা ছাদ, একেবারেই সাদামাটা একটা রেস্তোরাঁ। বলে না দিলে আলাদা করে বোঝার উপায়ও নেই। ম্যাল থেকে একটু নেমে

গেলেই চোখে পড়বে রেস্তোরাঁটা। সেখানকার প্রিয় খাদ্য নাকি চিকেন সসেজ। যারা আসে, এটাই আগে খায়।

আরও নানা রকম আইটেম সাজানো, যেগুলো সচরাচর অন্যান্য জায়গায় পাবেন না। এই ছাদ থেকেই কত ছবির শুটিং হয়েছে। সত্যজিৎ রায় নাকি একটা ব্ল্যাক কফি নিয়ে ওই ছাদে বসেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন। পাগলাটে চেহারার ঋত্বিকও এলে উঠতে চাইতেন না। তাকিয়ে থাকতেন ওই কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে। অমিতাভ, ধর্মেন্দ্র, রাজেশ খান্নারা যখন এসেছেন, নিরিবিলিতে দেখার তেমন সুযোগ পাননি। ছবি তোলার, সই নেওয়ার ভিড় যেন আড়াল করে দিয়েছে শ্বেতশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘাকে।

এমন অনেক অজানা গল্প নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেভেন্টার্স। বেশ কয়েকবার মালিকানার হাত বদল হয়েছে। এখন যাঁরা দায়িত্বে, তাঁদের সেই গর্ববোধ আছে বলে মনেও হয় না। ঐতিহ্যকে তুলে ধরার সেই উদ্যোগও নেই। পুরানো সেসব ছবিও সংরক্ষণে নেই। তবু কেভেন্টার্স কেভেন্টার্সই। লোকমুখে মুখে ছড়িয়ে যায় তার মাহাত্ম্য। ভিন দেশিরাও ছুটে আসেন, ভিড় করেন ওই ছাদে। তাঁরা কোন ঐতিহ্যের টানে আসেন, কে জানে!

আহারে বাহারে

বেঙ্গল টাইমসের জনপ্রিয় বিভাগ— আহারে বাহারে। এই বিভাগে থাকবে বিভিন্ন হেরিটেজ হোটেল, রেস্তোরাঁ বা খাবারের কথা। সেটা রেস্তোরাঁ না হয়ে চা, সরবত বা মিষ্টির দোকানও হতে পারে।

কলকাতার নানা প্রান্তে এমন কত দোকান ছড়িয়ে আছে। জেলায় জেলায় এমন কত প্রাচীন দোকান ছড়িয়ে আছে।

ইতিহাসের গন্ধ মাখা সেইসব দোকান বা খাবারের কথা আপনিও লিখতে পারেন। সেই দোকানের ঐতিহ্যের পাশাপাশি মিশে থাকুক আপনার অনুভূতিও। লেখার সঙ্গে ছবিও পাঠাতে পারেন।

লেখা ও ছবি পাঠানোর ঠিকানা:
bengaltimes.in@gmail.com

শান্ত গ্রাম বারমিক

কুয়াশাঘেরা জোড়পোখরি

রুমা ব্যানার্জি

শহুরে একঘেয়েমিতে ক্লান্তজীবন যখন প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিতে চায়, তখন মন ছুটে যায় নীল সবুজ হিমালয়ের কোলে কোনও অজানা গ্রামে। সেখানকার সোঁদা মাটির গন্ধ, ঝোপে ঝাড়ে ঝিঁঝি পোকার ডাক, হোমস্টের রান্নাঘর থেকে নেপালি সুরে গুনগুন, দূরে পাহাড়ের গায়ে জ্বলে থাকা টিমটিমে আলো — সব যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। কিছুটা নিমরাজি কর্তাকে বাগে পেয়ে বললেই ফেললাম, চলো কদিন পাহাড়ে ঘুরে আসি। হাতে বেশিদিন ছুটি নেই, বড়জোর চার– পাঁচ দিন। তাই বা মন্দ কী? কর্তা রাজি, শুধু শর্ত একটাই, দার্জিলিঙে থাকা চলবে না। অগত্যা তাতেই রাজি।

আগে থেকে তেমন প্ল্যান ছিল না। তাই বন্ধুর শরণাপন্ন হলাম। সে ফোন করে একটা মনের

মতো হোমস্টেও খুঁজে দিল, শহর থেকে দূরে, যেমনটি চাইছিলাম। বারমিক, কালিম্পং এর কাছে একটা নির্জন গ্রামে। গাড়িও ঠিক হল। এন জে পি থেকে তুলে নেবে। চালাও পানসি বেলঘরিয়া!

ভোরবেলায় দার্জিলিং মেল থেকে নেমে বাক্স পেঁটরা নিয়ে চড়ে বসলাম নির্দিষ্ট গাড়িতে। শহর ছাড়িয়ে একটু প্রাতরাশ, তার পর সেবক রোড ধরে সোজা বেঙ্গল সাফারি। আমার বন্য জীবজন্তু দেখার দৌড় চিড়িয়াখানা পর্যন্ত। খোলা পরিবেশে, সতর্ক পাহারায় দক্ষিণরায়কে দেখা এই প্রথম, তাও একহাত দূরত্বে। বানর, হাতি, হরিণ, ভাল্লুক, ময়ূর সব দেখার পরে দর্শন দিলেন স্বয়ং দক্ষিণরায়। অলস পায়ে, ঘাড় ঘুড়িয়ে, তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে হেঁটে চলে গেলেন সামনে দিয়ে। মন বলল, মহারাজা তোমাকে সেলাম।

সন্ধ্যা নামার মুখে পৌঁছে গেলাম বারমিক, পাহাড়ের ঢালে একটা ছোট্ট গ্রাম। ছড়ানো-ছেটানো কিছু বাড়ি। কালিম্পং থেকে রংপো যাওয়ার যে পাকা রাস্তা গ্রাম চিরে চলে গেছে, তার ধারে গোটা চার-পাঁচ দোকান। নিচে, অনেকটা নিচে খানিকটা সমানমতো জায়গায় একটা খেলার মাঠ। পাশে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় আরেকটা ঝরনা আছে গ্রামের গা-ঘেঁষে। অনেকখানি পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে একটা চওড়া পাথরের ওপর পড়ছে। সেখান থেকে প্লাস্টিকের বোতলে বা জারিকেনে ভরে জল আনে গ্রামের লোকেরা। সেটাই বলতে গেলে বারমিকের খাওয়ার জল। বাকিটা বৃষ্টির জল ধরে রেখে। পর্যটক এলে জলের গাড়ি বুক করতে হয়। পথচলতি ড্রাইভাররা অনেক সময় গাড়ি দাঁড় করিয়ে ঝরনা থেকে তাদের বোতলে জল ভরে নেয়। এসব নিয়েই এই গ্রাম। মালিক বেশ

আন্তরিকভাবে হাসি মুখে আমাদের স্বাগত জানালেন। ছোট্ট ছিম ছাম অথচ আধুনিক ব্যবস্থাযুক্ত বাড়ি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে যতদূরে চোখ যায়, শুধু সবুজ। মালকিনের হাতের রান্না সব ক্লান্তি ভুলিয়ে দিল। সেদিন তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। কারণ, পরের দিন কালিম্পং যাব।

কালিম্পং তিস্তা নদীর ধারে একটি শৈলশিরার উপর অবস্থিত। এমনিতে শহরটা বেশ ঘিঞ্জি। তবে দর্শনীয় স্থান অনেক। শহরের কাছেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত গৌরীপুর হাউজ। কালিম্পংয়ের আরেক দ্রষ্টব্য লেপচা মিউজিয়াম। এই শহরে বেশ কয়েকটি বৌদ্ধ মঠ, চার্চ অতিমারির কারণে বন্ধ। বিখ্যাত মর্গ্যান সাহেবের বাংলো সেটাও বন্ধ। আসলে, যাদের বুকিং থাকে, শুধু তাদের জন্যই খোলা। সামনেই একটা মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট। সেখানে ক্যাফেটোরিয়ায় বসলেই মন জুড়িয়ে যায়। যতদূর চোখ যাবে, গলফ কোর্স। এখানে কত যে সিনেমার শুটিং হয়েছে! এই মর্গ্যান হাউসেরও একটা ঐতিহ্য আছে। হন্টেজ হাউস খুঁজলেই একেবারে শুরুতে এসে যায় এই বাংলোর নাম। সাহেবি আমলের বাংলো। এখন পর্যটন দপ্তরের অধীনে। ভেতরটা নাকি অত্যাধুনিক, কিন্তু বাইরে দিকের আদলটা ইচ্ছে করেই ভুতুড়ে রাখা হয়েছে। কাছেই দূরপিন মনেস্ট্রি। ওখানে গেলেই মনে অদ্ভুত একটা প্রশান্তি আসে। দারুণ একটা ভিউ পয়েন্ট রয়েছে।

ক্যাকটাসের মনোমুগ্ধকর সংগ্রহ দেখতে গেলাম, পাইন ভিউ নার্সারিতে। এছাড়া হনুমান পার্ক, দুর্গামন্দির, কালীমাতা মন্দির প্রভৃতি জায়গা দেখার মতো। তিস্তা বাজারে মংপুর রেস্টুরেন্টে খেয়ে পেট মন দুটোই ভরল। এখনও মোমোর সুবাস পাচ্ছি যেন।
পরেরদিন দার্জিলিং, আমার স্বপ্নের শহর, দার্জিলিং। নীল আকাশের নীচে পাহাড়ের গায়ে ধূসর মেঘেদের আনাগোনা, সবুজ উপত্যকার গায়ে ছোট ছোট কাঠের বাড়ি, আর পাইন, দেবদারুর সাথে রডোড্রেনড্রন,

ক্যামেলিয়ার মেলবন্ধন ভ্রমণপ্রেমীদের বার বার টেনে নিয়ে যায় দার্জিলিং। মেঘ–কুয়াশার লুকোচুরিতে ব্যস্ত শহরের পাশ দিয়ে চলে যায় টয় ট্রেন। পাইনের অন্ধকার মাখা পিস প্যাগোডা যাওয়ার রাস্তা আমাকে বড্ড আর্কষণ করে। ভিউ পয়েন্টের রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে বারবার হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে কুয়াশায়, মেঘেদের ভিড়ে। গ্লেনারিজ আর ম্যাল ঘুরে তীর্থ করার আনন্দ নিয়ে রওনা হলাম। শর্ত অনুযায়ী দার্জিলিংয়ে থাকা হবে না। সুতরাং ঠিক হল থাকব কিছুটা দূরে, জোড় পোখরিতে।

জোড় পোখরি, হিমালয়ের কোলে পাইন আর ধুপি গাছের জঙ্গলে ঘেরা, কুয়াশা মাখা একটা ছোট্ট জায়গা প্রায় ৭৬০০ ফুট ওপরে, সেঞ্চল অভয়ারণ্যের একটা অংশ। এখন একদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে এমন। অন্যদিকে কার্শিয়াং আর দার্জিলিং।

দার্জিলিং ঘুরে রওনা হলাম জোর পোখরির উদ্দেশ্যে। চড়াই উতরাই পেরিয়ে মাত্র ১৯ কিমি রাস্তা। সান্দাকফু যাওয়ার জন্য মানেভঞ্জন বা চিত্রের দিকে না গিয়ে ধরলাম সুখিয়া পোখরির পথ। শুনশান রাস্তা, পাইন গাছের পাতা ঘেঁসে হওয়ায় বাজছে এক নৈসর্গিক সুর, দিনের শেষ তাই পাখির কূজনে পাহাড় থেকে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ছে মায়াবী সুরের ঝর্না, পথে রয়েছে কংক্রিটের তৈরি বেঞ্চ যেখানে বসে এই আনন্দ উপভোগ করা যায়।

সন্ধ্যা নামছিল পাইনের পাতা বেয়ে। কুয়াশা আর মেঘ চপল কিশোরীর মতো পথের আঁকে বাঁকে খেলা করছে দল বেঁধে। কান পাতলেন শোনা যায়, গাছ থেকে টুপ টাপ করে ঝরছে জলের ফোঁটা। আমাদের ড্রাইভার জানালো সামনেই একটা গোরস্থান, সব মিলিয়ে একটা গা শিরশিরে অনুভূতি ঘিরে ধরল।
যতক্ষণে আমরা হোমস্টেতে পৌঁছোলাম, ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমেছে। যদিও ঘড়িতে সময় সাড়ে পাঁচটা। দূরে কার্শিয়াং শহর জুড়ে আলো জ্বলছে। এমনকী বাগডোগরার আলো পর্যন্ত দেখা গেল।

হাতে গরম ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে যেন হারিয়ে যাচ্ছিলাম স্বপ্নের রূপকথার রাজ্যে। সব যেন ঘুমিয়ে আছে রুপোর কাঠির ছোঁয়ায়। যদিও ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমি নেই, তবে শুনলাম ওখানে হিমালয়ের স্যালামান্ডার দেখা যায়। যার আঞ্চলিক নাম গোড়া এবং বেশ কিছু বছর আগে ভাল্লুক দেখা গেলেও এখন আর তেমন বন্যপ্রাণী দেখা যায় না। নিশ্চিন্তে ঘরে ঢুকে পড়লাম।

সুন্দর সাজানো গোছানো ঘর, বড় বড় জানালার পর্দা সরালেই সামনেই দুটো পুকুর, এই জোড়া হ্রদের জন্যই জায়গার নাম জোড় পোখরি। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় এতটাই ঠান্ডা লাগছিল যে রুমহিটার নিতে হল। গরম গরম খাবার খেয়ে আমরা সে দিনের মতো যে যার ঘরে লেপ কম্বলের মধ্যে সিঁধিয়ে গেলাম। খুব ভোরে ঘুম ভাঙল। ঝকঝকে আকাশ আর সামনে অপরূপা কাঞ্চনজঙ্ঘা তার মোহিনী রূপে মাথায় সোনার মুকুট পরে উপস্থিত। সে দৃশ্য বর্ণনা করার ক্ষমতা ঈশ্বর আমাকে দেননি, শুধুই মুগ্ধতায় ঈশ্বরের এই অসীম দান প্রাণ ভরে গ্রহণ করলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ না যেতেই নেমে এল মেঘমালা, ঢেকে দিল আশপাশ। একটু আগের রূপের সঙ্গে কোনও মিল নেই এই কুয়াশা ভরা সকালের। দিন যত বাড়ল, কুয়াশা ততই ঘন হতে লাগল। সামনের শান বাঁধানো পুকুর একটা বিরাট সাপের মূর্তি যেন এই কুয়াশায় কেমন জীবন্ত মনে হচ্ছিল। জ্বলে সাঁতার কাটছে বেশ কিছু হাঁস, দূরের বাগানটায় চরে বেড়াচ্ছে আরও কতগুলো। পুকুর দুটি ঘিরে যত্নে লালিত মরশুমে ফুলের সারি আর তারপর সীমানা প্রাচীরের মত পাইন গাছের সারি, এক অসামান্য মেল বন্ধনে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিলাম।

মিরিকের পথ ধরে নিলে ফিরতে সময় লাগার কথা সাড়ে তিন ঘন্টা। তাই সকালটা ঘুরলাম চারিদিকে। আমি তখনও আমার চাতক মনটাকে ভিজিয়ে নিচ্ছিলাম এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে। ফেরার সময় নেপাল বর্ডারের এর কাছে পশুপতি মার্কেটে ঘোরা হল না, কারণ আতিমারির কারণে প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু তাতে দুঃখও নেই, যে দৃশ্য মন ভরে দেখেছি সেটা ফিরে অনেক দিন অক্সিজেন দেবে, বেড়ানোর এটাও একটা সুখ যে ঘুরে এসে সেই সুখ স্মৃতিকে মনে করে ঘটনার জাবর কেটে প্রতিটা মুহূর্ত আবার নতুন করে স্মৃতি পটে ফুটিয়ে তোলার আনন্দই আলাদা।

স্নিগ্ধ গ্রাম কোলাখাম

মেঘের চিঠি বয়ে বেড়ানো এক খাম। শান্ত, সুন্দর, স্নিগ্ধ গ্রাম— কোলাখাম। হুল্লোড় নেই, আছে অনাবিল শান্তি। এমন নিরালায় অলসভাবে কাটিয়ে দেওয়া যায় কত মুহূর্ত। ফিরে এসে লিখলেন **সুব্রত মণ্ডল**।

স্কুলের পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় তড়িঘড়ি কোলাখাম যাব ঠিক করলাম। জায়গাটার কথা আগেও শুনেছি। কয়েকটা ভিডিও দেখে কিছু প্রাথমিক ধারণাও হয়েছে। আসলে, আমার কাছে পাহাড় মানেই দার্জিলিং নয়। এইসব পাহাড়ি গ্রাম আমাকে আরও বেশি করে টানে।

রাতের ট্রেনে টিকিট পাওয়া বেশ ঝামেলার। নতুন ট্রেন বন্দে ভারত জিন্দাবাদ। রিজার্ভেশন পেতেও সমস্যা হল না। জোগাড় করলাম হিমালয়ান ওডিসির বুকিং। কথা হল কো-ওনার অনিরুদ্ধ সুরের সঙ্গে। সেইমতো কেয়ারটেকার কুমার রাই আমাদের জন্য কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ একটা রুমের ব্যবস্থা করলেন। চার দিনের পিকআপ, ড্রপ ও সাইট সিয়িংয়ের জন্য একটা গাড়ি প্যাকেজে করে নিলাম। বিরু তামাং কোলাখামেরই ছেলে। চার দিনের প্যাকেজ ও ১৩ হাজার টাকায় করে দেবে ঠিক হল। বন্দে ভারত দেড়টা নাগাদ এনজিপি পৌঁছাল।

বিরু তামাং স্টেশনেই অপেক্ষা করছিল। ট্রেনের মধ্যেই লাঞ্চ হয়ে গেছিল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চেপে বসলাম। গাড়ি তিস্তা ব্যারেজ, গজলডোবা, ডামডিং এমবিওক হয়ে লাভার রাস্তা ধরল। রাস্তায় ডুয়ার্সের জঙ্গল আর বেশ কিছু চা-বাগান চোখে পড়ল। একটু রোদ, একটু মেঘলা, একটা অদ্ভুত ভাল লাগার আবেশ যেন আমাদের ছুঁয়ে যাচ্ছে। এই পাহাড়, জঙ্গলের

সান্নিধ্য সত্যিই মানুষকে অনেক বেশি উদার করে তোলে। কোনও রাগ নেই, বিরক্তি নেই, হতাশা নেই, শুধুই একরাশ ভাল লাগা। লাভা পৌঁছানোর ঠিক আগে নেওড়াভ্যালির ভিতরে চেকপোস্ট ক্রস করে আমরা জঙ্গলের রাস্তা ধরলাম। এখান থেকে কোলাখাম সাত কিলোমিটার রাস্তা। জায়গায় জায়গায় একটু ভাঙাচোরা। কিন্তু আশপাশের রোমাঞ্চ এতটাই যে সেই ভাঙাচোরা রাস্তায় এতটুকুও বিরক্তি এল না।

সন্ধ্যে নামার ঠিক আগে পৌঁছে গেলাম কোলাখাম গ্রামে। এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন হোমস্টে। তার মধ্যে ক্যাসিরো ইন, দ্য নেস্ট, স্টার হলিডেজ, দ্য ট্রেল্‌স এই হোমস্টে গুলো উল্লেখ-যোগ্য। হোমস্টে হিমালয়ান ওডেসির ব্যালকনি থেকে সামনের উপত্যকা চমৎকার দেখা যায়। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে সামনের কাঞ্চনজঙ্ঘা কাল দেখা যাবে। এখানে বসে থাকলে মনে হয়, অলসভাবে সময় বয়ে যাক। মনে হয়, আমার আর কোথাও যাওয়ার নেই, কিচ্ছু করার নেই। হোমস্টের ঘরোয়া খাবার আমাদের সত্যিই তৃপ্ত করেছিল। এই যেমন হাতে গড়া রুটি, চিকেন, সবজি, ডাল আলু-পরোটা, চা। বৃষ্টি হলেই আবার এখানে কারেন্ট চলে যায়। হোমস্টের কোনও রুমে টিভি নেই। একদিক থেকে ভালই হয়েছে। নাই বা দেখলাম টিভি। টানা ব্রেকিং নিউজ থেকে অন্তত কয়েকদিনের বিরতি। মেঘ রোদ্দুরের সঙ্গে গল্প করতে করতে কয়েকটা দিন কেটে যাবে। আর লিখব ডায়েরি। সঙ্গী আছে কিছু বই। রাতের খাবার খেয়ে একটু বাইরে এসে দাঁড়ালাম। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে, তার মাঝে ব্যালকনি জুড়ে বিভিন্ন ফুল আর অর্কিডের বাহার অসাধারণ লাগছিল।

পরের দিন আকাশ ভালই ছিল। খুব ভোরে উঠে পড়লাম কিছু ছবি তুলব, আর গ্রাম ছেড়ে পাইন গাছের জঙ্গলের দিকে রাস্তা ধরে কিছুটা দূর হেঁটে আসব বলে। কিছুটা দূরে যেতেই গ্রামের চতুষ্পদেরা আমাদের সঙ্গী হল। যতদূর হেঁটে গেছি ওরা আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি। আবার যখন ফিরছি তখনও ওরা সঙ্গেই ছিল। ফিরে এসে বেলার দিকে বেড়িয়ে এলাম লাভা, নোকদাঁড়া,

রিশপ আর টিফিনদাঁড়া ভিউ পয়েন্ট। মূল রাস্তা থেকে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে প্রায় কিলো মিটার খানেক পথ একটা ছোটখাটো ট্রেক হয়ে। আমাদের সঙ্গে ছোট ছেলে ও মেয়েও বেশ উপভোগ করতে লাগল।

রাতে বৃষ্টি নামল। সকালে কিছুটা পরিষ্কার। পৌঁছে গেলাম ছাঙ্গে ফলস। সেখান থেকে উপরে উঠে এসে নেওড়া ভ্যালির ভিতর দিয়ে রাচেলা টপ গেলাম। রাস্তাটা বেশ এবড়ো খেবড়ো। লাভা বাজারের বিজয়কুমার তার বোলেরো গাড়িতে করে আমাদের রাচেলা টপে নিয়ে গেল। উপরে উঠে সম্মোহিতের মতো অনেকক্ষণ কাটালাম। শুধু মেঘ আর কুয়াশা। দূরে পর্বতের দর্শন তাই হল না। লাভা ফিরে এলাম। পথের ধারে লাভা বাজারের মুখে লামু ফুড সেন্টারে গরম গরম ওয়াই ওয়াই, চিকেন মোমো আর নুডলস খেলাম। তারপর গেলাম মনাস্ট্রি। চারটের সময় প্রার্থনা শুরু হল। এই প্রথম মোনাস্ট্রির ভিতর ছোট–বড় নানান বয়সী লামাদের সঙ্গে পুরো প্রার্থনা পর্ব উপভোগ করলাম।

রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। পাশের রুম থেকে কর্ণবিদারক আওয়াজ ভেসে আসছে... ও সাকিরে, সাকিরে সাকি.... বুঝলাম কালরাত্রে যে চারজন মেয়ে এই হোমস্টেতে এসে উঠেছে, তারাই আনন্দ ফুর্তি করছে। রাত্রির নিস্তব্ধতা নির্জনতাকে খানখান করে দিচ্ছিল শহুরে এই মেজাজ। কিছুটা রাগই হচ্ছিল। এরা কেন এই শান্ত গ্রামে আসে। এটা যে হুল্লোড় করার জায়গা নয়, এটুকুও বোঝে না! কাল রাত্রে আরও একজন বয়স্ক কাপল এই হোমস্টেতে এসেছেন। তাঁদের কথা ভেবেও খারাপ লাগছিল। কোলাখাম বিখ্যাত অসংখ্য পাখির গুঞ্জনের জন্য। বোধহয় তারাও এই রাত্রে ঘুমোতে না পেরে বিরক্ত।

ভ্রমণ শেষে পরের দিন পাহাড়জুড়ে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সেরা সঞ্চয় হয়ে থাকবে হোম-স্টের সামনে কুমার রাই ও তার পরিবারের সঙ্গে আমাদের ছবিখানা। অনেক অভিজ্ঞতা আর ভাল লাগার আবেশ নিয়ে ফেরার রাস্তা ধরলাম।

কুয়াশাঘেরা ছোট্ট গ্রাম পাবং

নূপুর রায়

কালিম্পং শহর থেকে মাত্র ২২ কিলোমিটার দূরে ছবির মতো সুন্দর গ্রাম পাবং। গুটি কয়েক ঘর বাড়ি, একটা প্রাইমারি স্কুল, দু চারটে হোম স্টে, দুটো বিলাসবহুল ফার্ম হাউস। এ বাদে এখানে সত্যিই আর দেখার কিছুই নেই। তবে যা আছে তার হল অনাঘ্রাতা, অসামান্যা প্রকৃতি। চারিপাশে ঘিরে থাকা ন্যাওড়া ভ্যালির বিস্তীর্ণ জঙ্গল, কান পাতলেই ভেসে আসা পাখির কূজন আর মেঘের গায়ে লেগে থাকা বুনো ফুলের ঘ্রাণ। এমন একটা জায়গায় দু একদিন কাটিয়ে গেলে এমনিতেই মন ভাল হয়ে যায়।

কুয়াশার ওড়না জড়ানো নীলচে সবুজ পাহাড়, এলাচের ক্ষেত, ঝাড়ু গাছের ক্ষেত চিরে নিকষ কালো একটা পিচের রাস্তা পাকদণ্ডীর মতো উঠে গেছে একেবারে উপরে, ওই সবুজে মোড়া পাহাড়ের মাথায়। ওটাই হল চারখোল।

কালিম্পঙ থেকে পাবং আসার রাস্তাটাও অসাধারণ। মন কেড়ে নেওয়া একান্ত আপনজনের মতো। প্রতি মুহূর্তে ঘন সবুজ বর্ষণস্নাত প্রকৃতি দু'হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করে বলে, এই তো এলে, একটু জিরিয়ে গেলে না হয়।

পথের সৌন্দর্য বড়িয়েছে দুই সহোদরা গ্রাম রেলি আর পলা আর তাদের নিজস্ব দুই নদী। ভরা বর্ষায় ঝমঝমিয়ে পাথর ডিঙিয়ে নেচে নেচে বয়ে চলেছে চপলা বালিকার মতো। খুব ইচ্ছে ছিল পা ডুবিয়ে ওদের সঙ্গে গল্প করি। বলি, আসবো আবার। এই তো চিনে গেলাম। সে আর হয়ে ওঠেনি।

পাবংয়ে আমরা উঠলাম ভট্টরাই হোমস্টে তে।। সম্ভ্রান্ত নেপালী ব্রাহ্মণ পরিবারের নিজস্ব বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া তিনটে ঘরেই পর্যটকদের থাকার

ব্যবস্থা। নিজস্ব ক্ষেত খামার, গোয়ালঘর, কাঠের দোতলা বসত বাড়ি, প্রশস্ত উঠান— সব মিলিয়ে খুব সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশ। পুজো উপলক্ষে শহর থেকে আত্মীয় স্বজন এসেছেন। আর সঙ্গে যোগ দিয়েছি আমরা তিনজন। পুরো বাড়ি জুড়ে উৎসবের আমেজ। খুব সহজেই আমরা এবাড়ির সকলের সঙ্গে মিশে গেলাম।

বাধ সাধলো প্রকৃতি। আগের রাত থেকে যে বৃষ্টিটা শুরু হয়েছে, এখানে এসে তা আরও প্রবল আকার ধারণ করল। টিপ টিপ, রিমঝিম, ঝমঝম কোনও উপমাতেই তাকে আর বেঁধে রাখা গেল না। ছোটবেলায় পরীক্ষায় খুব কমন একটা রচনা ছিল— 'একটি বর্ষণ মুখর দিনের অভিজ্ঞতা'। এর যথার্থতা জীবনের প্রথমবার মন প্রাণ দিয়ে অনুভব করলাম। আর বৃষ্টি একটু ধরতেই ছাতা সম্বল করে সোজা গ্রামের পথে।

প্রকৃত অর্থে গ্রাম বলতে যা বোঝায় এখানে তার রূপ কিছুটা ভিন্ন। পাহাড়ের কোলে অনেক সময় ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে দেশলাই বাক্সের মতো হঠাৎ করে একটা একলা বাড়ি নজরে আসে। এই হোমস্টে-টা অনেকটা তেমনি। বেশ কিছুটা এলাচের ক্ষেত পেরিয়ে আসতে হয়। এরপর ইতস্তত কিছু ঘর বাড়ি, নতুন তৈরি হচ্ছে এমন কিছু হোমস্টে, আর তার পর একটা প্রাইমারি স্কুল। উপরে ওঠার পথে রয়েছে অত্যাধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন কিছু ফার্ম স্টে। পাবং থেকে চার কিলোমিটার হেঁটে চারখোল গিয়ে ফিরে আসা যায়। আবহাওয়া প্রতিকূল থাকায় আমরা সেভাবে যাইনি।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে পৌঁছোলাম প্রাইমারি স্কুলের প্রাঙ্গণে। সেখানেই দুর্গা পুজোর আয়োজন হয়েছে। সারা গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে আনন্দ করছে। আমরাও সেই উৎসবে সামিল হলাম। পুজো শেষে প্রসাদ খেয়ে টিকা লাগিয়ে ফিরতে না ফিরতেই আবার আরেক প্রস্থ বৃষ্টি। তারপর এল সেই মায়াবী সন্ধে। একটা একটা করে দূরের পাহাড়ে জ্বলে উঠল আলো। বিন্দু বিন্দু সেই আলোগুলো জুড়ে গিয়ে তৈরি হল আলোর মালার। হিরের নেকলেসের মতো দ্যুতি ছড়ালো মেঘের গায়ে। এক সুতোয় বাঁধা পড়ল দূরপিন দাঁড়া, কালিম্পং, আলাগড়া থেকে সুদূর ভূটানের কিছু অংশ।

দূরের পাহাড়ের আলো দেখার সৌভাগ্য আগে হলেও, এত সুন্দর নির্দিষ্ট আকৃতি আগে কখনও দেখিনি। আবারও মুগ্ধ হলাম। কিছু মুহূর্ত লেন্সবন্দি হল। যা চর্মচক্ষে দেখতে পাইনি তা মানসচক্ষে কল্পনা করে নিলাম। আফসোস একটাই, আবহাওয়া ভাল থাকলে এ বাড়ির উঠান কিংবা জানালা থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা– সহ হিমালয়ের একটা বিস্তৃত রেঞ্জ দেখা যায়। কিন্তু আমরা তা দেখতে পাইনি।

খাওয়ার টেবিলে কথায় কথায় গল্প জমে উঠল। কার্শিয়াং থেকে এবাড়িতে পুজো উপলক্ষ্যে এসেছেন কাকু –কাকিমা। দু'জনই অধ্যাপক। ভাল বাংলা জানেন। ওনাদের কাছ থেকেই জানলাম পাহাড়ের শিক্ষা ব্যবস্থা, চাকরি–সহ বিভিন্ন সমস্যার কথা। জানলাম এই পাবং এর কথা। ১৯২০ সালে দূরপিন দাঁড়াতে আর্মি ক্যাম্প তৈরি হলে ওখানকার জনবসতিকে পাবং ও কাফের গাঁও তে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। ওনারা সেই ভাবেই এখানে এসেছেন। কাকু নিজে হাতে নতুন স্বাদের খাসির মাংস রান্না করে খাওয়ালেন। এই মাংস দু'দিন ধরে সংরক্ষিত হয়েছে কাঠের উনুনের তাপে, ফলে একটা আনকমন ফ্লেভার ছিল। খাওয়ালেন নিজের হাতে তৈরি স্পেশাল পান, মিষ্টি আরও কতকিছু। বলাবাহুল্য, এগুলোর কোনওটাই আমাদের প্রাপ্য পরিষেবার আন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিছু মানুষ এভাবেই মনের কাছাকাছি চলে আসেন। পরের দিন এই ভালোলাগাটুকু সঙ্গে নিয়েই চলে যাব চারখোল। ওখানেই কাটিয়ে আসব বাকি দুটো দিন।

বেঙ্গল টাইমস

১০ জুন, ২০২৩

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in